কয়েকটি গল্প

নাসরিন সুলতানা সিমা

কয়েকটি গল্প

নাসরিন সুলতানা সিমা

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন

✍ প্রকাশকের কথা

বাংলা সাহিত্য আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। শত সীমাবদ্ধতা নিয়েই এগিয়ে চলছে আমাদের সাহিত্য যাত্রা। এই যাত্রাপথের অগ্রজরা অক্লান্ত শ্রম দিয়ে বাংলা সাহিত্য ভান্ডারের বীজ বুনেছেন সযত্নে। আমাদের উত্তরপুরুষদের কলমের ছোঁয়ায় সে বীজ অঙ্কুরোদগম হয়ে বৃক্ষে পরিনত হয়েছে। সমকালীন কলম সৈনিকদের অব্যাহত লেখনিতে সেই বৃক্ষ আজ ফুলে-ফলে সুশোভিত হচ্ছে। এক দূর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে মায়ের ভাষার শব্দ মিছিল। এ বড় আত্মতৃপ্তির ! এ বড় গর্বের!

অমর একুশে বইমেলা। এক গর্বিত ইতিহাস। বই নিয়ে এমন উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা প্রমাণ করে আমাদের মিছিলের গতিপথ ঠিকই আছে। জ্ঞানরাজ্যে আমাদের প্রজন্ম স্বপ্রণোদিত বিচরণ করছে। প্রয়োজন মিছিলের নেতৃত্বদানকারীদের প্রজ্ঞা ও সঠিক দিক নির্দেশনা। সোশ্যাল মিডিয়ার বৈপ্লবিক উন্মেষের জোয়ারে মলাটবদ্ধ জ্ঞানকে পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করার ধরণ ও কৌশল বদলে যাচ্ছে। সময়ের সাথে পাঠকদের রুচি, অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে যাচ্ছে। একইসাথে সময় বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে লেখনির ধাঁচও পাল্টে যাচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের লেখক-লেখিকা নিত্য-নতুন ধারনা নিয়ে পাঠকদের চিন্তার রাজ্যকে দ্রুত অধ্যয়ন করার চেষ্টা করছে। নতুন নতুন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও হাল ধরতে চাইছে শক্ত করে।

এই প্রচেষ্টার একটা অংশ ‘কয়েকটি গল্প’ গল্পগ্রন্থ। নতুন প্রজন্মের লেখিকা নাসরিন সুলতানা সিমা এখানে বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের গল্প বলেছেন। সমাজে ঘটে যাওয়া দৃশ্যপটকে নিজের মত করে একটি সুনির্দিষ্ট দর্শন ও বিশ্বাস থেকে তুলে ধরেছেন। গল্পগুলো পড়ে পাঠকদের মন:জগতে চিন্তার উদ্রেক হবে বলে বিশ্বাস করি। তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান ‘গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স’ গল্পগ্রন্থটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে অত্যন্ত পুলকিত ও উচ্ছ্বসিত।

আমরা তরুণ প্রজন্মের চিন্তাশীল ও মেধাবী লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে বদ্ধপরিকর। আমরা বিশ্বাস করি- ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।’

ভাষার মাসে আমরা আশা করব, বাংলা সাহিত্যকে নিয়ে কাজ করতে তরুণরা এগিয়ে আসবে। তাদের ঘষামাজা ও পরিচর্যা করার দায়িত্ব নিয়ে আমরা পরিতৃপ্ত হতে চাই।

লেখিকার প্রথম গল্পগ্রন্থ। নতুন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। দু’য়ে মিলে ভুল-ত্রুটি হওয়া অস্বাভবিক নয়। আশা করছি সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। পরবর্তী সংস্করণে আরো যত্নবান হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে চাই। ভাল থাকুন। ভাল কাটুক প্রতিটি ক্ষণ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

✍ লেখিকার কথা

শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মহান রবের দরবারে, যিনি আমাকে লেখালেখির সুযোগ করে দিয়েছেন। জীবনের অনেকটা সময় পেরিয়ে এসেছি। জমেছে কিছু গল্প। মানুষের জীবনের গল্প। মানুষের জানা-অজানা, আনন্দ-বেদনার গল্প। অক্লান্ত পরিশ্রমে কখনও মানুষ হাসতে ভুলে গেছে। আবার মৃদু আলোর পরশ পেয়ে সেই মানুষই প্রাণ খুলে হাসার চেষ্টা করেছে। কেউ কাঁদে পাওয়ার আনন্দে, আবার কেউবা কাঁদে হারানোর কষ্টে। প্রতিজন মানুষের জীবনে লুকিয়ে আছে অসংখ্য গল্প। সব গল্প হয়তো মোড়কে আবদ্ধ হয় না, তবে থেকে যায় হৃদয়ের মোড়কে আজীবন। সেগুলো থেকেই কিছু বেছে নিয়েছি। কলম দিয়ে সাজানোর চেষ্টা করেছি প্রতিটি লাইন। হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা ঢেলে দেয়ার চেষ্টা করেছি। লেখালেখিতেই প্রাণ খুঁজে পাই। লিখতে গিয়েই উপলব্ধি করেছি সমাজটাকে বদলে দেয়া প্রয়োজন। সমাজের প্রতিটি কোণে যে অসুস্থতা ছড়িয়ে আছে, সেগুলো দূর করা জরুরি। যখন অন্যায়গুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, কলমটাকে তখনই খুব যত্নে লালন করেছি। তাতে হয়তো খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠবে আমাদের চারপাশ। সেই প্রত্যাশা নিয়ে জমানো গল্পগুলো লিখেছিলাম। গল্পগুলো প্রচ্ছদের বর্ণিল ছোঁয়ায় পূর্ণতার দেখা পাবে সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। কাছের মানুষগুলোর উৎসাহে আজ সেটা পূরণ হতে চলেছে। সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ হয়তো আপনাদের ভালো লাগবে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা!

নাসরিন সুলতানা সিমা

সূচিপত্র

হৃদয়ের গভীরে / ১১

অস্তিত্বের গল্প / ২০

অসমাপ্ত গল্প / ২৮

প্রতারণা / ৩২

মায়ায় ঘেরা / ৩৮

অন্তরালে অন্ধকার / ৪৩

বিশ্বাস / ৫৬

কাঙ্খিত / ৬৩

বিচ্ছুরিত আলো / ৭৩

অনিশ্চিত গন্তব্যে / ৭৭

ছায়াসঙ্গী / ৮৫

হৃদয়ের গভীরে

এক

কাঁচের গ্লাসে শিশির বিন্দু জমে আছে। সামনের সবকিছু ঝাপসা। ব্যালকোনির গ্লাস শীতের শুরু থেকেই অমন করে বন্ধ আছে। প্রায় দিনই শিশিরে ভিজে এমন ঝাপসা হয়ে থাকে। পাশেই টেবিলে শ' খানেক বই আলগা পড়ে আছে। দেখলেই বুঝা যায় বইগুলো এতোটাই ব্যবহৃত যে গুছিয়ে রাখার মতো সুযোগ কেউ পায় না। টেবিলের পাশের কর্নারে সবুজ সতেজ পাতাবাহারের ঝালর উপর থেকে ক্রমশ নিচের দিকে নেমেছে। গ্লাসের ওপাশে অনতিদূরে একটা লেক খুব ধীর গতিতে বয়ে চলেছে। টেবিলের পাশে রাখা নরম চেয়ার টেনে বসলেন এক মহীয়সী। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। চশমার চারপাশের মুখমণ্ডলে বার্ধক্যের প্রবল ছাপ। অনেকগুলো দাঁতই হারিয়েছেন। পরনে লম্বা গাউন। সাদা চুলগুলোর ফাঁকে দু-একটা কালো চুল দেখা যায়।

হোম মেইড মেয়েটি কাজ শেষ করে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলো। মহীয়সী নিজের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখলেন, মারিয়া ডি কষ্টা। পাশে আরো একটি নাম মারিয়া হোসাইন। হোম মেইডের সামনে ধরে বললেন- পড়ো।

হোম মেইডের দৃষ্টি জুড়ে বিস্ময়! শিক্ষিতা হোম মেইড দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠলো- 'এটা কী করে হয় ম্যাম? আপনি কি খৃষ্টান ছিলেন?'

গাম্ভীর্যপূর্ণ 'হ্যাঁ' সূচক মাথা দোলান বৃদ্ধা। নেমে যাওয়া চশমাটি ঠিক করে পরেন। ভারী গলায় বললেন- 'ছিলাম! বাবা মায়ের কলিজার টুকরো একটিমাত্র সন্তান ছিলাম আমি। শৈশব কেটেছে লন্ডনে। পরে বাবার চাকুরীর কারণে ইন্ডিয়াতে চলে আসি।

সে প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। বিয়ে করেছিলাম এক ভারতীয় হিন্দুকে। বাবা-মা মেনে নেননি। নিজ ধর্ম বিসর্জন দিয়ে অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করা যেকোন পরিবার, সমাজ ও ধর্মের জন্য ভয়াবহ পাপের! শ্বশুরবাড়ি থেকেও কেউ মেনে নেয়নি। স্বামীর সাথে গাছতলায় থাকবো বলে প্রতিজ্ঞা করলাম।

দু'জন মিলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। ক্ষুধা পেলে ঘাস লতাপাতা যা পেয়েছি, এই দাঁত দিয়ে চিবিয়েছি। কখনো মন্দিরে ঘুমিয়েছি, কখনো গীর্জায়। বিশ্রাম নিয়েছি কখনো গাছের ডালে,

কখনো খোলা আকাশের নিচে। তখন শীতকাল ছিলো। শীতের প্রকোপে চেহারা এতটুকু প্রায়। তখন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি শীতার্তদের যন্ত্রণা, ক্ষুধার্তদের হাহাকার, পিপাসার্তদের আহাজারি!

একদিনের ঘটনা শোনো...। কথা শেষ না করেই হোম মেইডের দিকে তাকান মারিয়া হোসাইন। বললেন- 'লাঞ্চের প্রস্তুতি শেষ করেছো?'

-'জ্বি ম্যাম। লাঞ্চের প্রস্তুতি শেষ। আমি অতি আগ্রহে আপনার পরবর্তী ঘটনা শুনতে অপেক্ষা করছি!'

মারিয়া হোসাইন হাসেন। তার হাস্যোজ্জ্বল মুখে যেন নিরন্তরের গল্প। বললেন- 'তোমার নাম কি যেন? দেখেছো এতো এতো স্টোরী, পোয়েট্রি, কোটেশন, হাদিস মাথায় স্থান গেঁড়ে আছে যে তার ভীড়ে তোমার নামটা রেখে দেয়ার জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না। আর নাম বলতে মনের পুরোটা জুড়ে একটা মাত্র নামই... যাই হোক তুমি কি কষ্ট পেলে?'

- 'জ্বি না, ম্যাম। বলুন প্লিজ। আমার নাম সামিয়া।'

- 'ও আচ্ছা, ঠিক আছে শোনো তাহলে। মন্দিরের এক কলতলায় গোছল সেরে ভেতরে ঢুকছিলাম। ততদিনে ঐ মন্দিরই আমাদের ঘর, সংসার, সমাজ। সবকিছু। মাঝে মাঝে অনেকেই পূজো দিতে আসতো, বিভোর হয়ে দেখতাম। কত লোক আসে, কত লোক যায়। শুধু আমরা দু'জন থেকে যেতাম। আসা-যাওয়ার মিছিল দেখেই ভাল লাগা খুঁজে নিতাম। একদিন আমার স্বামীর মা আসলেন ... একটু শ্বাস নেন মারিয়া হোসাইন। স্বামীর নামটাই তো বলিনি তোমায়, শুনবে না?'

- 'জ্বি শুনবো, আপনি বিরতি দিলে এই প্রশ্নই করতাম।'

- 'হুম, ওর নাম প্রসেনজিৎ সেন। শাশুড়িমা ছেলেকে দেখতে পেয়ে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরেন। অনেকক্ষন ধরে কাঁদলেন। বললেন- খোকা তুই এখানে, তোকে কত খুঁজেছি বাবা। অনেকটা সময় পেরিয়ে যায় ছেলেকে ছাড়েন না তিনি। বুঝতে পেরেছিলাম মা-ছেলের জমানো কথাগুলো আজ বের হয়ে আসছে অবিরাম। আমি কেমন অপাংক্তেয় এক প্রাণী যেন। নিজেকে সে সময় খুব অসহায় মনে হচ্ছিল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছিল মুহূর্তেই। মনে হলো কতদিন আমায় কেউ অমন মমতায় জড়িয়ে রাখেনি। বাবার প্রিয় মুখটা মনে পড়লো, সাথে মায়েরও। মেয়ে বলে কি না, তখন আমারও বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। ভাবছিলাম, বাবা জড়িয়ে ধরে বলতো- আমাকে একা ফেলে বেশ আছিস না? মা-ছেলে বেশ কিছুক্ষণ কথা হলো। শাশুড়িমা আমার সাথে কোন কথা না বলেই পূজো সেরে চলে গেলেন। আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে দেখছি- শাশুড়িমা চলে যাচ্ছেন। এগিয়ে গিয়ে কিছু বলার সাহস হলো না।'

দুই

এক সপ্তাহ পর। প্রসেনজিৎ আমাকে খুব বেশি ভালোবাসতে শুরু করলো। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম। ভেতরটায় এমন একটা অনুভূতি তৈরি হল, যা বলে শেষ করার মতো না। ওকে বললাম - তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও যে মৃত্যুর মতো মনে হবে। ও তখন মলিন হেসে বলল- কিছু মুহূর্তের জন্য তো ছাড়তেই হবে। একটু থেমে ... আমাদের অন্তত একটি কামরা থাকবে, যেখানে একসাথে ঘুমাবো, ভোরবেলা জেগে দু'জন দু'জনের ঘুম জড়ানো মুখটা দেখবো। আমি ওকে থামিয়ে দিলাম। রাজপ্রাসাদসম বাড়িতে মানুষ হওয়া এই আমার তখন একটি কামরা নিয়ে স্বপ্ন দেখাও যেন খুব বেশি কিছু মনে হচ্ছিল। গত রাতের অবশিষ্ট খাবার দু'জনে ভাগ করে খেয়ে নিলাম। এরপর প্রসেনজিৎ প্রতিদিনের মতো বের হয়ে গেল কাজের খোঁজে। কিন্তু সেদিন সে ফিরেনি। আর কোনদিনই ফিরে আসেনি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন মহীয়সী। তাকান সামিয়ার দিকে। সামলে নিয়ে বললো- চলো নামাজ সেরে লাঞ্চ করি।

- 'জ্বি ম্যাম, তবে পরের ঘটনার জন্য উদগ্রীব থাকবো, বলেই মুচকি হেসে দেয় সামিয়া।'

- 'ওকে।' মলিন কণ্ঠ মারিয়া হোসাইনের।

অত্যন্ত প্রশান্তচিত্তে যোহরের নামাজ আদায় করলেন। মারিয়া হোসাইন সামিয়াকে সাথে নিয়ে একই টেবিলে একই খাবার খেতে পছন্দ করেন। সামিয়া প্রথম দিকে সংকোচ করতো, পরে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

পড়ন্ত বিকেল। শীতার্ত রুক্ষ এই আবহাওয়া সবসময় মারিয়া হোসাইনকে শূন্যতার শিক্ষা দিয়ে জানান দিয়েছে এই পৃথিবীতে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য থেকে যে বিচ্যুত হবে, সে কখনই পূর্ণতার দেখা পাবে না। বরং ধীরে ধীরে শূন্যতার শেষ অবধি পৌছে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কখনো হয়তো টেরই পাবে না। কতোটা মূল্যবান অবস্থান সে হারিয়েছে যা কখনো ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। শূন্য দিগন্তে দৃষ্টি মেলেন মারিয়া হোসাইন। সেখানেও কেবল শূন্যতার সৌন্দর্য দেখতে পান। অনুধাবন করেন শূন্যতার এক আলাদা টান আছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। শূন্যতারও মালিক আছে। এক নিমেষেই যিনি শূন্যতাকে পূর্ণতায় ভরিয়ে দেন। সেই মালিকের কাছে আজ মারিয়া হোসাইন কিছু যেন চায়। জীবনের পূর্ণতা!

সামিয়া কফি নিয়ে ছাদে আসে। আনমনা মারিয়া হোসাইন টের পাননি। সামিয়া সামনে ছোট্ট একটা টেবিলে কফির মগ রেখে দেয়। ওর হাতেও একটা। দরদভরা কণ্ঠে ডাকে, -ম্যাম!

ওর মুখের দিকে তাকান মারিয়া হোসাইন। চশমা খুলে চোখ মুছতে শুরু করেন, হাসার চেষ্টা করেন। বলেন-এসেছো? টেরই পাইনি। আছরের নামাজ পড়েছো?

-জ্বি ম্যাম। আপনাকে এখানে রেখে গিয়ে আগে নামাজ পড়ে নিয়েছি। তারপর কফি বানিয়েছি।

-ম্যাম এখন কি পরবর্তী ঘটনা বলবেন? কফিতে চুমুক দিয়ে বলেন -'হুম বলবো তো বটেই।'

একটু চুপ থাকেন আরো কয়েকবার চুমুক দেন কফির কাপে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শুরু করেন মলিন কণ্ঠে- 'ফিরে গিয়েছিলাম বাবা মার কাছে। বাবা মা মেনে নিতে চাইলেও খ্রিষ্টীয় সমাজ মেনে নেয়নি। তাড়িয়ে দিয়েছিলো। সেই তাড়ানোর দৃশ্য দেখে ফেলে হোসাইন। আমার আত্মার স্পন্দন, প্রতিটি মুহূর্ত যাকে আমি অনুভব করি। সে ছিলো মুসলিম। এভাবে বিপর্যস্ত একজন নারীকে ফেলে সে চলে যেতে পারেনি। ও সেদিন বলেছিল, -'আপনি চাইলে আমি আপনার সহযোগিতা করতে পারি।'

বাইরের কারো এমন কথা শুনে আমি আরো বেশি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। কিন্তু কি কারণে যেন ওর কথায় আস্থা খুঁজে পেয়েছিলাম। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলাম। অকস্মাৎ ওর আচরণে কান্না থেমে যায় আমার। স্তম্ভিত হয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি জড়িয়ে ধরার সাথে সাথে ও খুব দ্রুত আমার বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পেছনে কয়েক ধাপ সরে গিয়ে বলেছিল- আমি মুসলিম!

আমার স্বাভাবিক হতে বেশ সময় লাগে। ভাবছিলাম, কোন যুবক অসম্ভব সুন্দরী একজন নারীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে কিসের টানে? আর তাছাড়া আমাদের সমাজে এভাবে ছেলেমেয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরা কোন ব্যাপারই না। বরং এটাই স্মার্টনেস।

স্বাভাবিক হয়ে বললাম, -'আপনার সাহায্য প্রয়োজন আমার।'

ও আমাকে একটা মহিলা হোস্টেলে নিয়ে যায়। সেখানে থাকা-খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেয়। হাতে দশটা বই ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলো, -'আমি প্রসেনজিৎকে চিনি। ওদের পাড়াতেই থাকি, প্রতিবেশী হিসেবে ওর সব ব্যাপারে জানি। ও গতকাল বিয়ে করেছে...আমি আবারও কেঁদে ফেলি। আমার প্রসেনজিৎ বিয়ে করেছে আবার...। ও কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, -'আপনাকে যে বইগুলো দিয়েছি ওগুলো পড়বেন। দেখবেন দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে। আপনি নিজেকে জানবেন। নিজের করণীয় বুঝতে পারবেন। কষ্টগুলোও হালকা হয়ে যাবে'।

আমি হঠাৎই ওকে প্রশ্ন করেছিলাম- 'আপনি কি আসবেন মাঝে মাঝে?'

-'না তা সম্ভব হবে না। বরং বইগুলো পড়া শেষ হলে হোষ্টেল প্রধানকে জানাবেন। আরো বই পাঠিয়ে দিব। আর মাসিক যাবতীয় খরচ পাঠিয়ে দিব। যতদিন আপনার আয়ের কোন ব্যবস্থা না হয়। ও সেদিন চলে যায়।

আমি বইগুলো নেড়ে দেখি। একটা বইয়ে দৃষ্টি আটকে যায়।

'বাইবেল ও কুরআন!'

তিন

সামিয়াকে সাথে নিয়ে রাতের খাওয়া শেষ করেন মারিয়া হোসাইন। এরপর আবার শুরু করেন।

-'আমি ঐ হোস্টেলে দুই বছর থেকেছি। দুই বছরে প্রায় ছয়শত বই পড়েছি। সব বইই হোসাইন পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু একদিনও আমার সাথে দেখা করেনি। আমি প্রতিদিন অপেক্ষা করেছি। ও আসেনি। আমি একদিন খবর পাঠালাম দেখা করব বলে।

কিন্তু ও বলে পাঠিয়েছিলো- 'দেখা করার মতো কোন প্রয়োজন আমাদের থাকতে পারে না'।

বইগুলো পড়ে আমার চিন্তার রাজ্যে বিরাট পরিবর্তন আসলো। সিদ্ধান্ত নিলাম মুসলমান হবো। দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলাম। হোসাইনের বাড়ি থেকে আমাকে ডেকে পাঠায় ওর বাবা-মা। আমি যাবার পরে বললেন- আমার জন্য বিয়ের ব্যবস্থা করতে চান আংকেল-আন্টি। একটা ছেলেও দেখে রেখেছে। ইঞ্জিনিয়ার। সেদিনও হোসাইন সামনে আসেনি। খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার। অনেক কথা বলার ছিলো, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিলো বলে ফিরে এসেছিলাম। এরপর একটা জব পেয়ে যাই সোশাল মিডিয়া নামে এক গবেষণাগারে। এভাবেই চলছিলো। হোসাইনের বাবা-মা'র দেয়া বিয়ের সে প্রস্তাব আমি ফিরিয়ে দিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম-

'আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বিয়ে করব না। আপনাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার নতুন জীবনের জন্য। একজন মুসলিম হিসেবে পরিচিত হতে পেরে আমি গর্বিত। হোসাইনের দেয়া বইগুলো আমাকে সব ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে সরল-সোজা পথের দেখা দিয়েছে। সশ্রদ্ধ সালাম আপনাদেরকে।'

ইতি
মারিয়া

এভাবেই চলছিলো। হঠাৎ একদিন শুনলাম হোসাইন হাসপাতালে। পাগলের মতো ছুটে ওর কাছে গিয়েছিলাম। মনে পড়ে সেদিন একটা অটোর সাথে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে যাই। ভাগ্য ভালো ছিলো। ফুটপাতে পড়ে গিয়েছিলাম। হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম ওর ব্রেইনে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। বাক্যটা শোনার সাথে সাথে আমার পুরো পৃথিবী যেন উলট-পালট হয়ে যায়। একটু নির্জন স্থান খুঁজে নিয়ে চিৎকার করে কেঁদেছিলাম। শুধুই মনে হচ্ছিলো, হোসাইনের সাথে আমার থাকা না হোক, কিন্তু এই পৃথিবীতে কোথাও সে থাকবে না এটা কি করে আমি মেনে নেব? সিদ্ধান্ত নিলাম ওকে বিয়ে করার। ওর বাবা-মাকে নিজেই নিজের ইচ্ছেটা জানালাম। ওর এই কষ্টকর সময়গুলোতে পাশে থাকার

আকুতি জানালাম। ওনারা আপত্তি জানিয়ে বলেন, -'নাহ! এ কি করে সম্ভব? এ সময় বিয়ের কথা? আর তাছাড়া তোমার সামনে অনেকটা পথ। না, না। আমরা তোমার জীবন নষ্ট করতে পারি না।'

আমার অবস্থান দেখে ওনারা সম্মতি দিতে বাধ্য হলেন। নতুন সমস্যা হলো হোসাইন কোনভাবেই রাজি হচ্ছিল না। পাঁচদিন পর সে সম্মতি দেয়। হাসপাতালেই বিয়ে হয় আমাদের। সেদিন অসংখ্য রোগী, ডাক্তার, নার্স আমাদের বিয়েতে জমায়েত হয়েছিলো। সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়েছিলেন আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন।

চার

এরপরের ঘটনা শুধুই ভালোবাসার। হোসাইনের জন্ম ছিলো বাংলাদেশে। কিন্তু বেড়ে ওঠা ভারতে। হোসাইনের ইচ্ছেতেই আবার বাংলাদেশে ফিরে ওর পরিবার। সাথে আমি। ওর দাদু লাউয়াছড়া রেইন ফরেস্টের এই বাংলোটা চাকরি সূত্রে পেয়েছিলেন। পরে স্থায়ীভাবেই তাকে দিয়ে দেয়া হয়। সবাই মিলে এই বাংলোতেই উঠি। হোসাইনের আমার ভেতরটাকে প্রশান্ত রাখতো সবসময়। ওর প্রসঙ্গ উঠলে, ওকে দেখলে মনে মনে একটা কথা উচ্চারিত হতো- এই মানুষটাকে আমি খুবই ভালোবাসি।

ও শেষ ক'টা মাস আমাকে এতো সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত উপহার দিয়েছে, যে মুহূর্তগুলোকে আঁকড়েই আমার এই পুরো সময় কাটিয়ে এসেছি। লাউয়াছড়া আসার দু-তিন দিন পর হঠাৎ শুনি সবাই যশোর চলে যাবে। ওখানে গ্রামের বাড়ি। সবার মতো গোছগাছ শুর করেছি আমিও। সবাই রেডি। আমিও রেডি হচ্ছি। হোসাইন এসে আমার মাথায় আটকানো ওড়না একটানে খুলে ফেলে পেছন থেকে আমায় জড়িয়ে ধরে বললো-

-'আমাকে এখানে একাকী ফেলে চলে যাচ্ছো'? আমি ওর স্পর্শে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিলাম। অবাক হলাম। বললাম- বুঝিনি তোমার কথা।

-'আমি যশোর যাচ্ছি না!'

-'কেন?'

-'বাবা মা আপু সবাই তোমাকে আর আমাকে কিছুদিন একাকী সময় দিতে চেয়েছেন তাই!;

ওর বাক্য শেষ হয় না। আমি আনন্দে আত্মহারা! শক্ত করে জড়িয়ে ধরি ওকে।

সবাই চলে গেলেন। শুধু আমরা দু'জন। অনেকটা হানিমুনের মতো। সময়গুলো খুব দ্রুতই চলে যাচ্ছিলো।

থেমে যান মারিয়া হোসাইন। এরপরের আর কিছুই বলব না তোমায়। খুব যন্ত্রণার কথাগুলো বর্ণনা করি না। বর্ণনা করা যায় না। শুধু একটা কথা বলি সামিয়া। আমি যখন থেকে হোসাইনের সততা দেখেছি, চোখ বন্ধ করে ওকে ভালোবেসেছি। ওর মতো মানুষকে কখনো ভালো না বেসে থাকা যায় না। ওর প্রতিটি ইবাদাত খুব যত্নে পালিত হতে দেখতাম। ওকে দেখে শিখেছি মানুষের সৌন্দর্য তার কাজে, তার দৃষ্টির পলকে, তার মুখের কথায়। এগুলো সুন্দর হলে আপনাতেই তার দৈহিক অবয়বকে পছন্দ করা যায়। যদি সে সুন্দর না হয় তবুও।

অস্তিত্বের গল্প

এক

বাহির বারান্দায় টিমটিমে কুপি জ্বলছে। রাতটা খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন। ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে ঝিঁমিয়ে ঝিঁমিয়ে গল্প শুনছে নাতী-নাতনীর দল। ডিসেম্বর মাস। শীত জেঁকে বসেছে প্রতিটি শরীরে, লেপ-কম্বল জড়িয়ে আছে প্রত্যেকে। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি সব বন্ধ। গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসা সবাই ওদের দাদু ভাইকে ঘিরে বসে আছে। মাঝে মাঝে আঙিনায় লাগানো হাসনাহেনার হৃদয় কাড়া সুগন্ধে মাদকতা ছড়িয়ে পড়ছে শরীর ও মনে। লেবু গাছ থেকেও ঝাঁঝাঁলো ঘ্রাণ এসে নাসিকা রন্ধ্রে জেগে থাকবার উৎসাহ যোগাচ্ছে। কেউ কেউ ওখানেই ঘুমে বিভোর। বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়া যারা। দাদাভাই গল্প বলে চলেছেন। স্বাধীনতার গল্প। সার্বভৌমত্ব ফিরে পাবার গল্প। চিল শকুনের নখর দিয়ে অস্তিত্ব ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার গল্প। দাদা ভাই সহ সবার হাতে চায়ের মগ। লাল আদা চা। এদের রাত জেগে পড়ার অভ্যাস থাকায় ঘুমকে পাত্তা দিচ্ছে না। বাড়ির রান্নাসহ টুকিটাকি সব কাজ দেখাশোনা করা মর্জিনা বুয়া ওদেরকে এইমাত্র চা বানিয়ে দিয়ে গেছে। চায়ের সাথে টা হিসেবে কাঁচা মরিচ, পিঁয়াজ, চানাচুর সরিষার তেল দিয়ে মুড়ি মাখা। মর্জিনা যাবার সময় বলে গেছে-

-'আমার ঘুমে আর ডিস্টার্ব দিবেন না কইলাম হু!'

দাদা ভাই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বলা শুরু করলেন- 'তখন সবে মাত্র থানা শহরের একটা কলেজে ভর্তি হয়েছি। যাতায়াতে কষ্ট হতো বলে বাবা হোষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। পড়াশুনা নিয়ে খুব স্বপ্ন ছিল আমার। ১৯৭১ সাল। উত্তাল সারাদেশ! যুদ্ধ যুদ্ধ রব চারেদিকে। দেশ নিয়ে তখনও কোন ভাবনা মাথায় ঢোকেনি আমার। ভাবতাম যত যা হোক আমাদের এই কলেজের ক্লাস যেন বন্ধ না হয়। আমার পরিবারটা যেন অক্ষত থাকে। তোমরা ভাবছো আমি স্বার্থপরের মতো চিন্তা করেছিলাম সেদিন তাইনা?'

জামিল হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে। চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে বলল-'দাদা ভাই, এটা তুমি কি করে ভাবতে পেরেছিলে? দেশ বলে কথা।'

সবাই জামিলের কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ে। দাদা ভাই হাসেন। সে হাসিতে একরাশ হতাশা। বললেন- 'হুম সে তো বটেই দেশ বলে কথা। তোমরা এক একজন দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে পড়ছো। জামিল, অহনা, অর্থী তোমরা সবাই। নাহিয়ান, আকাশ, হৃদি, মেডিকেলের স্বনামধন্য ছাত্রছাত্রী। তোমরা বলো। সত্যিই কী তোমরা দেশকে স্বার্থহীনভাবে ভালোবাসতে পেরেছো? চারপাশে এতো খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি দেখেও কী নিজের ক্যারিয়ার গড়ার কথা এক মুহূর্ত ভুলে গেছো? দেশ নিয়ে গভীর ভাবে কিছু ভেবেছ??

মাথা নিচু করে ওরা। দাদাভাই বুঝতে পারেন। প্রসঙ্গ আর বাড়ান না। লজ্জা যা পাওয়ার পেয়েছে ওরা। বুদ্ধিমানদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। ওখানে থামিয়ে রাখেন সে কথা।

পূর্বের জের টানার আগে চায়ে চুমুক দেন। বলেন- 'দু-একদিনের মধ্যেই কারফিউ জারি হয়। স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তখন এই গ্রামের যারা ছিলাম, তারা সদলবলে নিজ গ্রামে ফিরে আসি। চারেদিকে এক অসহনীয় আতঙ্ক! ভয়ে মানুষগুলো কেউ ঘরছাড়া। কেউ ঘরকুনো। চারেদিকে কানাকানি, ফিসফিসানি। কিন্তু যখন যুদ্ধের ডাক এলো, তখন শুরু হলো সাহসিকতার উচ্ছ্বাস!

আমি এক টুকটুকে লাল পরীকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম তখন। সে নাইনে পড়ত। ওকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম। মনে মনে বহুবার বউ সাজিয়েছি! এই যে দেশে এতো অরাজক অবস্থা তাও ঐ টুকটুকিই আমার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে থাকতো। একদিন এক ঝোঁপের আড়াল থেকে দেখছিলাম ওকে। ও সরাসরি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল-

-'এতো কম সাহস নিয়ে যুদ্ধে নামবে কি করে? সাহস থাকলে সবার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে নিও বারবার! '

আমি পুলকিত হয়েছিলাম ওর কথাগুলো শুনে। সে আমার প্রথম প্রেম!

এরপর একদিন আমার সামনে আমার বাবাকে গুলি করে মিলিটারিরা। জেদ চাপে বুকের ভেতরে। বাবার রক্তই আমায় অপরাজেয় সাহস যুগিয়েছিলো। ট্রেনিংয়ে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করেছিলাম। আমার অস্ত্রচালনা দেখে মুগ্ধ হয়ে সমবয়সী সতেরো জনের কমান্ডার বানিয়ে দেয়া হয় আমাকে! জীবনের মোড় ঘুরতে থাকে সব হারানোর দিকে! একে একে মা, ছোট্ট পুচকে, আদুরে বোনটি...। থেমে যান দাদাভাই। রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠনালী। ওদের চোখও অজান্তে ভিজে ওঠে। ওরা দাদাভাইকে জড়িয়ে ধরে। শব্দ করে কেঁদে ফেলেন দাদাভাই। পাশের মসজিদ থেকে ঠিক তখনই ফজরের আযান ভেসে আসে। ওরা জানে দাদাভাই প্রতি রাতে ইবাদাত বন্দেগী করতে করতে না ঘুমালেও ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমান। নাহিয়ান নিজের অশ্রু মুছে বলল- 'থাক এখন আর না। যদিও এখনই সেই মুহূর্ত এসেছে যা শোনার জন্য আমরা অধীরভাবে আগ্রহী। কিন্তু দাদাভাইয়ের সুস্থতার জন্য ঘুমানো প্রয়োজন। চলো উঠি আমরা।'

দুই

সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ ঘুম থেকে জেগে উঠলো অহনা আর অর্থী। ওরা দুই বোন। ওরা ফ্রেশ হতে হতেই বাকিরা উঠে পড়লো। রান্নাঘর থেকে তখন শীতের পিঠার ঘ্রাণ ছুটে আসছে। খেজুরের রসের প্রাণ কাড়া ঘ্রাণ ওদের ক্ষুধা বাড়িয়ে দিলো। রান্নাঘরের পাশে কোমল রোদে আরাম কেদারায় বসে রোদ পোহাচ্ছেন ওদের দাদাভাই। পাশেই ওদের মা, বাবা, চাচা-চাচী বসে আছেন। সামনে পাটি বিছিয়ে বাহারী পিঠা সাজিয়ে রাখছেন মর্জিনা বুয়া। ওরা দাদাভাইয়ের কাছে যার যার মতো বসে পড়ে। দাদাভাই পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন। বলেন- 'আমার বাহির আঙিনা আজ ভরপুর, আলহামদুলিল্লাহ।'

স্কুল পড়ুয়াদের অবস্থা দেখে মজা নিচ্ছে সবাই। ওরা মুখ গোমড়া করে আছে। কারণ গত রাতে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো বলে গল্প মিস করেছে। আকাশ হেসে হেসে বলল- 'এই তোদেরকে আমি পরে সব শুনাবো ঠিক আছে?'

ওরা সমস্বরে চিৎকার দিয়ে ওঠে, ইয়েএএএ! আর হুমড়ি খেয়ে আকাশের শরীরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আকাশ পড়ে যেতে নিয়ে নিজেকে সামলায়। ব্যস্ত হয়ে বলে- 'তোরা কি মেরে ফেলবি আমায়? গল্প শোনা অব্দি বাঁচিয়ে রাখ। আর তাছাড়া পিঠা না খেয়ে মরলে...। থামিয়ে দেন আকাশের মা। খালি উল্টা-পাল্টা কথা বলিস কেন আকাশ?

এবার সে থেমে যায়। সবাই মিলে পিঠা খেয়ে সকালের নাস্তা সেরে নেয়। এখন ওরা বেরুবে গ্রামটা ঘুরে দেখার জন্য। দাদাভাইকে দুপুরের খাওয়ার পর গল্প শোনাবার জন্য রাজি করিয়ে নেয়। ঘড়িতে দু'টা বাজার সংকেত। কেউ কেউ এসে বসেছে দাদাভাইয়ের কাছে বাকিরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে হাত-মুখ মুছতে মুছতে এসে বসলো।

অহনা উদ্বেলিত কণ্ঠে- 'আজ রান্নাটা ফাটাফাটি হইছে। সারাজীবন মুখে লেগে থাকবে। জামিল ওর হাতের আঙুল দিয়ে অহনার মাথায় টোকা দিয়ে-শিখে নে বুঝলি, বরের মন জয় করতে পারবি। অহনা রেগে যায়। বাকিরা হেসে দেয়। দাদাভাই অহনাকে কাছে টানেন। মুচকি হেসে বলেন -'ওকে রাগাচ্ছো কেন জামিল? চুপটি করে বসো সবাই। কোথায় যেন ছেড়েছিলাম?'

অর্থী বলল- 'ঐ যে দাদাভাই তোমার ছোট্ট বোনটির কথা...। বাকিরা বলল- 'হ্যাঁ দাদাভাই ওখান থেকেই বলো।

দাদা ভাই বলছেন -'তখন যুদ্ধ থেকে হয়তো দু'মাস তিনমাস পরপর দশমিনিট বা আধাঘণ্টার জন্য পরিবারের মানুষগুলোর সাথে দেখা করতে আসতাম। সেদিন এসে শুনলাম আমার বড় দুই ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারি। আর আমাকে খুঁজে গেছে।'

মা তখন নির্বাক প্রায়, ছোটবোনটাকে সারাক্ষণ বুকে জড়িয়ে রাখতেন। পাঁচ বছরের ছোট্ট বোনটি আমার। কী নিষ্পাপ! কত কথা বলত! সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখত! সেবার আমাকেও বলল- 'ছোটদা যুদ্ধ শেষ হলে আমার চুলের জন্য দুটো ব্যান্ট নিয়ে এসো। চুল বড় হয়ে গেছে কিন্তু। নাপিত আসে না, চুল দিয়ে চোখ ঢেকে যায়। গলা ধরে আসে দাদাভাইয়ের। ওভাবেই বলতে থাকেন- পরের বার ফিরে এসে ওকে পাইনি। পুরো গ্রামে যে গুটি কয়েক মানুষ ছিলো সবাই কেঁদে কেঁদে কবর দেখিয়েছিল। যারা আড়াল থেকে দেখেছিল তারা ওর শহীদ হবার ঘটনা বলেছিল।

'মিলিটারিরা এসে নাকী সেদিন মাকে জবরদস্তি করছিল আমার খোঁজ দিতে। চুল মুঠি করে ধরে টানা হ্যাঁচড়া করছিলো। সে সময় বোনটা আমার এসে বলেছিলো- 'ছাড়ো, আমার মাকে মারছো কেন? তোমরা খুব পঁচা খুব, ছাড়ো'। তখন ওর ছোট্ট কচি বুকটায় গুলি করে ঝাঁঝড়া করে দেয় বর্বরগুলো। মা কথা না বলায় মাকেও গুলি করে!

-'আমি সেদিন খুব কেঁদেছিলাম। নিঃস্ব হয়েছিলাম সব হারিয়ে। তখন আমার টুকটুকি এসে সবার সামনে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল। কানে কানে বলেছিলো- 'দেশ স্বাধীন করে ফিরে এসো। আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য। আর কারো মা বোনকে এভাবে মরতে দিও না!'

কিন্তু সে অপেক্ষা করতে পারেনি। ও যখন আমাকে কানে কানে কথাগুলো বলছিলো, তখনই মিলিটারি আসার সংবাদ দিলো কে যেন। ও তখন আরো শক্ত করে ধরে আমায় বলল- 'আল্লাহর দোহাই লাগে, আমার যা হয় হোক তুমি ওদের সামনে আসবে না। তোমার সাথে আরো সতেরোটি প্রাণ জড়িয়ে আছে তুমি লুকিয়ে থাকো।'

ও আমাকে খড়ের গাদায় লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ওকে সেদিন তুলে নিয়ে যায় মিলিটারিরা...। আমার ভেতরটা তখন অসহ্য যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো।

তিন

আছরের নামাজ শেষে দাদাভাই ওদের সাথে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। মাগরিবের নামাজ পড়ে নাস্তা সেরে নেয় ওরা। পাশের বাড়ির দাদি ওদের জন্য এক হাঁড়ি খেঁজুরের গুড়ের পায়েস, খেজুরের রসের এক পাতিল হাতে বানানো সেমাই পিঠা, খাঁটি ঘিয়ে ভাজা লুচি সাথে খাসির মাংসের ঝাল ঝাল তরকারি পাঠিয়েছিলেন। স্বাস্থ্য সচেতন, ডায়েট কন্ট্রোল করা হৃদিও পেট পুরে খাচ্ছে সবই। নাহিয়ান হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে,-'হৃদি, ওয়েট বেড়ে যাবে না?' অন্যরা মিটমিট করে হাসছে। হৃদি মুচকি হেসে বলল- 'মজা নিস না? নে নে। ইয়ে মানে এখন খাচ্ছি। কিন্তু ঢাকায় ফিরে কমিয়ে দেবো। সিম্পল। দাদাভাই কোথায়? অর্থী বলল- ছবি আনতে গেছেন। ওনার ছোট বোন, মা ভাইদের।

অনেকগুলো এ্যালবাম হাতে নিয়ে ফিরে আসেন দাদাভাই। ওরা ছবিগুলো খুব আগ্রহ নিয়ে দেখে। ওদের অত্যাধুনিক মোবাইল, আইফোনে সেগুলো ধারণ করে নেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজমে অনার্স করা জামিল গল্পগুলো নোট করে রাখছে। সে বলল, - 'দাদাভাই, যুদ্ধের গল্পের বাইরে একটা প্রশ্ন করি?'

-'হ্যাঁ করো।'

-'দাদির সাথে কোথায় দেখা হয়েছে তোমার? আর দাদি কি তোমার সেই টুকটুকির কথা জানতো? তার নাম কি ছিলো?'

-'আমি তোমার প্রশ্ন মেমোরিতে নোট করে রাখলাম। পরে উত্তর দেব।'

-'ওকে দাদাভাই। বলো এরপর।'

-'দেশ স্বাধীন হলো। আমরা আমাদের স্বাধীন সার্বভৌমত্ব ফিরে পেলাম। বাড়ি ফিরে এলাম। এই সেই বাড়ি তখন ধ্বংসপ্রায় অবস্থা। গ্রামে পরিচিত দু-একজন ছাড়া সবাই নতুন। সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মাসিক অর্থ প্রদানের উদ্যোগ নিল। জেলা শহরে গিয়ে আবার ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হলাম। ভালো রেজাল্ট করেছিলাম। অনার্সে ভর্তি হলাম। একদিন ক্লাস করে ফিরছিলাম। রাস্তায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে দেখলাম। গাড়িগুলোর দিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। দ্রুত বেগে ছুটে আসা ট্রাকের নিচে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচালাম তাকে আমি। সেই নারীটিই তোমাদের দাদি। সরকারি সহায়তায় চিকিৎসা করিয়েছিলাম। মিলিটারিদের হাতে নির্যাতিতা নারীটিকে পাগল অবস্থায় বিয়ে করি আমি। যদিও সে কিছুই বুঝতো না। যা বলা হতো তাই বলতো, করতো। কেন বিয়ে করেছিলাম জানো তোমরা?

সবার বিস্মিত প্রশ্নবোধক চাহনী। দাদাভাই প্রশান্তির হাসি হাসেন। -'সেইতো আমার লাল টুকটুকে পরীটা। আমার প্রথম প্রেম! ফিরে পেয়েও দু-মাস লেগেছিলো চিনতে। চেনা যাচ্ছিলো না। চেহারায় অত্যাচারের দাগ। কালো হয়ে গিয়েছিলো খুব। কণ্ঠ শুনে একটু একটু পরিষ্কার হতে থাকলো। চেহারায় মিল খুঁজে পেলাম। আর আমি পাগল হতে থাকলাম ওর প্রেমে।'

ওরা অত্যধিক বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে অস্থির হয়ে দাদির চেহারার সাথে মিল খুঁজতে থাকলো। কারণ ছবি দেখার সময় টুকটুকে লাল পরীটির সাথে দাদির তেমন মিল খুঁজে পায়নি। এবার খুঁজে পেয়ে প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠলো। দাদাভাই বলে চলেছেন- 'প্রায় তিন বছর লেগেছিলো সুস্থ হতে।'

সুস্থ হয়ে ও আমাকে চিনতে পেরে বলেছিলো- 'শফিক দেশ স্বাধীন করে ফিরেছো তুমি তাই না? আমি জানতাম তুমি পারবে...।

ওর কথার উত্তর দিইনি। আমি পাগলের মতো কেঁদেছিলাম। সব হারিয়েও যেন সব ফিরে পেয়েছিলাম। তাই আনন্দে...। হাসেন দাদাভাই। জামিলের দিকে তাকিয়ে- 'নাম পেয়েছো দাদির! উচ্ছ্বল কণ্ঠ জামিলের।

-'আরে পেয়েছি মানে। ঐতিহাসিক এক নাম পেয়েছি দাদাভাই!

দাদাভাই হাসিমুখে বলে চলেছেন-'খুব ভালো কাটছিলো সময়। একে একে পাঁচটা ছেলেকে পৃথিবীর আলো দেখালাম দুজন মিলে। সেই সুখ স্থায়ী হলো তিরিশ বছর। পনেরো বছর হলো আমার টুকটুকে লাল পরী আবার আমায় ছেড়ে গেলো। কিন্তু ওর স্মৃতি এতো প্রখর যেন সবসময় আমার সাথেই আছে বলে মনে হয়। আবেগে গলা ধরে আসে ওদের।

নাহিয়ান বলে- 'স্বার্থক প্রেম দাদাভাই। স্যালুট এই অপরাজেয় জুটিকে।'

ওরা সবাই দাঁড়িয়ে যায়। সশ্রদ্ধ স্যালুট জানায় একসাথে। বুক ভরে যায় দাদাভাইয়ের। আরো বেশ কিছুক্ষণ গল্প করে রাতের খাবার খেতে যায়। রাত পেরোলেই ব্যস্ততম নগরীর দিকে যাত্রা করতে হবে। ভেবেই বিমর্ষ হয়ে যায় ওরা। তবু...।

অসমাপ্ত গল্প

অফিসের লিফটে লম্বা লাইন। তাই বাধ্য হয়ে খুব দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে নাসির। প্রায় দিনই দেরি হয়ে যায় অফিসে আসতে। অফিসে ঢুকতেই নাসিরের কলিগ নিচু কণ্ঠে বললো- 'স্যার দেখা করতে বলেছে।'

- 'আচ্ছা করবো।'

নাসির অফিসে ঢোকা মাত্র অন্যদের ভেতরে এক চাপা গুঞ্জন শোনা যায়। সেদিকে কান দেয় না সে। জীবনের অন্তর্নিহিত সময়গুলোর মধ্যে খুব কম সময়ই সে অবসর পেয়েছে। কাজ শুর করার আগে বসের সাথে দেখা করে আসে। যথারীতি তিক্ত কিছু বাক্য কানে ঢুকিয়ে ফের ফিরে নিজের ডেস্কে। নীরবে কাজ করে যায়। এক সময় অন্যদের গুঞ্জন থেমে যায়। কাজের চাপে গলার আর কোন স্বর যেন শুনতে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে যায় হেঁটে হেঁটে। কি এক গভীর টান ওকে পাগলের মতো তাড়া করে। চারপাশের কোনকিছু ওকে থামাতে পারে না। ওর দৃষ্টিকে ছুঁতে পারে না। ও কেবল এগিয়ে যায় সামনে তাকিয়ে। বাসায় ফিরে ঘরগুলোতে আলো জ্বালায়। মূল রুমের সুইচে হাত দেয়ার আগেই ক্ষীণ একটা কণ্ঠ ভেসে আসে-

- 'জিরো লাইটটা জ্বালিও।'

নাসির মুচকি হাসে। জিরো লাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে যায় খাটে শুয়ে থাকা এক নিথর শরীরের পাশে-

-'চাঁদমুখটা না দেখলে ক্লান্তি মিটবে না যে!'

- 'তাই! চারপাশে কত চাঁদমুখ দেখোনি বুঝি?' কপালের এলোমেলো চুলগুলো আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললো।

- 'আমার আকাশে একটাই চাঁদ আছে, থাকবে।'

- 'আচ্ছা ঠিক আছে হেরে গেলাম, এবার তো ফ্রেশ হয়ে নাও।'

- 'হুম, যাচ্ছি।'

- ' কি খাবে বলো। একবারে বানিয়ে আসবো তোমার পাশে।'

- 'কি জানি বুঝতে পারছি না। বুয়াতো স্যুপ খাওয়াতে চেয়েছিলো। আমি খাইনি। তোমার হাতে খাবো। ওটাই খাইয়ে দিও। আর টেবিলে তোমার জন্য স্যান্ডউইচ বানিয়ে রেখে গেছে।'

নাসির ওয়াশরুমে ঢোকে। নিজে ফ্রেশ হয়ে গরম জলে স্যাভলন, আর ফেসওয়াশ মিশিয়ে আসে। খাটের বসে প্রিয়তমার পুরো শরীর যত্ন কওে মুছে দেয়। দ্বিতীয়বার শুধু গরম পানি দিয়ে মুছিয়ে শুকনো গামছা দিয়ে আরও একবার। অসুস্থ নিথর মানুষটির কণ্ঠে ইতস্তত ভাব- 'থাক না! এতো কষ্ট তুমি কিভাবে করতে পারো?'

কথা বলে না নাসির। মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার কাজে মনোযোগ দেয়।

ডিনার সারে দু'জনই। নাসির মলিন কণ্ঠে বলো- 'সাবা।'

- 'হুম, বলো।'

- 'তুমি এখন কেমন বোধ করছো?'

- 'ভালো। তোমাকে একটা কথা বলি?'

- 'বলো।'

- 'আজকেও অফিসে তোমাকে বকেছে আমি জানি। রোজ রোজ এই একঘেয়েমি তোমার ভালো লাগে? তোমার কী ইচ্ছে করে না, সকালবেলা তোমার স্ত্রী তোমায় রান্না করে নাস্তা করিয়ে অফিসে পাঠাবে। দুপুরের খাবারটাও প্যাক করে পাঠিয়ে দেবে।

আর সন্ধ্যায় যখন ফিরবে তখন তোমার সামনে চেইঞ্জের পোশাকগুলো এগিয়ে দেবে। দু'জন একসাথে বসে চা পান করবে।'

একটু থামে সাবা। ওর কণ্ঠ রুদ্ধ। আবার বলতে শুরু করে- 'আমি নিজেকে কি করে ক্ষমা করবো?

সাবার ঠোঁটে হাত রাখে নাসির।

- 'আর বলো না প্লিজ। দেখো জীবনের সবগুলো ধাপ সবার সাথে মিলতে হবে তারতো কোন মানে হয় না সাবা। আমি তোমাকে ভালোবাসি। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা। তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই ভাবতে পারি না। বিশ্বাস করো ঠিক এই কারণে অফিসের বসের বকা, কলিগদের নিন্দা সবটায় আমি হজম করতে পারি। আমি যখন রাস্তায় হাঁটি তখনও আর কিছুতেই আমার মন বসে না। বন্ধুদের সাথে চায়ের আড্ডার কথাও মাথায় আসে না। মনে হয় আমি ফিরছি আমার প্রিয়ার কাছে। আর বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, যাবতীয় প্রশান্তি আমি তোমার কাছেই পাই। আলহামদুলিল্লাহ। আমি ছুটি শুধুই তোমার দিকে। তুমি কখনো নিজেকে ছোট মনে করো না। আমার কোনদিনই মনে হয়নি যদি এমন হতো...। তবে তুমি সুস্থ হও এটা মনেপ্রাণে চাই।'

সাবা কাঁদে। ঝরঝর করে ওর চক্ষুযুগল থেকে অশ্রু নামে।

- 'তুমি এতো ভালো কেন? নাসির ওর খুব কাছে চলে যায়। অশ্রু মুছে দেয়। বলে- 'কেঁদো না প্লিজ। তোমার জন্য একটা কবিতা লিখেছিলাম শুনবে সাবা?

- 'হ্যাঁ, অবশ্যই। শুনাও প্লিজ। লাইট জ্বালাও।'

নাসির শুরু করে-

'অতলান্তের পরিশ্রান্তিতে তুমি এক কাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম,

সহস্র দুঃখবোধে তোমার দৃষ্টিতেই সুখকর অনুভব!

সমস্ত মলিনতায় অগণিত উজ্জ্বলতা তুমি,

আমি ফিরে আসি বারবার তোমার কাছেই!

তুমি থাকবে অমলিন এই হৃদয়ের মণিকোঠায়

একমাত্র সত্য হয়ে তুমিই শুধু তুমি!'

আবারো কাঁদে সাবা। তোমাকে ছেড়ে মরতেও ইচ্ছে করে না নাসির!

প্রতারণা

এক

'ছাইকাঠি দেখেছো তুমি আকাশ?'- প্রশ্নকর্তা উত্তরের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ। উত্তরদাতা নির্বিকার। তাই দেখে নিজেই বলতে শুরু করে। তুমি কী করে দেখবে! রাজকীয় স্বকীয়তায় বড় হয়েছো। ছাইকাঠি দেখা তো দূরের কথা, হয়তো এটার অর্থই জানো না। আকাশ নামের মূর্তিসম স্থির মানুষটিকে জোরে ঝাঁকায় অনিক। কী কথা বলছো না কেন? আকাশ তবুও চুপ। বসে আছে সোফার এক কোণায়। যেন জায়গার খুব সংকট। অনিক নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিমর্ষ আকাশের ভীত মুখাবয়ব দেখে একটুও মায়া হচ্ছে না। সে এবার দৃঢ় কণ্ঠে- 'পুলিশকে আমি জানাবো এবার। দেখি আমায় কী করে আটকাও।'

আকাশ এবার নড়ে চড়ে বসে। হাসার চেষ্টা করে।

- 'অনিক! মিথ্যা কথা বলছো। তুমি তো আমার খুব ভালো বন্ধু। তাই না বলো?'

- 'তুমি জানোই আমি মিথ্যা কথা বলি না।'

কথা শেষ করার আগেই টেলিফোনে নাম্বার চাপতে শুরু করে দেয় অনিক। আকাশ এবার তড়িৎ বেগে উঠে এসে অনিকের বাম বাহু শক্ত করে ধরে। নিজের মুখোমুখি ঘুরিয়ে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে- 'তুমি খুব ভালো করে জানো, আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতির জন্য আমি তোমার কি অবস্থা করতে পারি। রক্তের বন্যা বয়ে যাবে বলে দিলাম।'

অনিক আকাশের বুকে ডান হাত রেখে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। রাগান্বিত কণ্ঠে বলে- 'এছাড়া আর কী করবি তুই হ্যাঁ? এতো বড় অপরাধ করে আসার পরও কোন রকম অনুতপ্ত হওয়ার ইচ্ছা পর্যন্ত নেই। ছি!'

দুই

অনিক পণ করেছে আকাশের সাথে আর মোটেও মিশবে না। ওরা একসাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স করছে। আকাশ বাউন্ডুলে প্রকৃতির। বাবার অগাধ সম্পদের ব্যবহার যত্রতত্র। তবে ভালো কাজে তা খুব কমই ব্যবহার হয়। ডজনখানিক গার্লফ্রেন্ডেও তার মন ভরে না।

ক্যাম্পাসে একজন। ফেসবুকে একজন। মোবাইলে ঘন্টার পর ঘন্টা কারো সাথে চালিয়ে যায় প্রেমালাপ। অর্থাৎ যেখানেই তার পদার্পণ ঘটে, সেখানেই গার্লফ্রেন্ডের খোঁজ চলে। অনিক বহুবার বুঝানোর চেষ্টা করেছে। এসবের পরিণতি খুব একটা ভালো হয় না। কে শোনে কার কথা? শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পাসের গার্লফ্রেন্ডকে খুন করে পদ্মা নদীতে ফেলে দিয়েছে আকাশ। ঐ মেয়েটাও ওদের সাথেই পড়তো। অনিক খুব সাধারণ পরিবারের সন্তান। নুন আনতে পান্তা ফুরায় টাইপের। বাবা নেই তাই পড়াশুনার পাশাপাশি টিউশনি সহ পার্টটাইম জবে আছে। পাঁচ ভাইবোনের বড় সে। বোনের বিয়ের জন্য আবার টাকাও জমাচ্ছে।

অনিক ওর ছাত্রের বাসায়। চায়ের কাপ ওর ডান হাতে। মোবাইলটা বেজে ওঠে। প্রতিদিনের মতো ওর ছাত্র মুচকি হাসে। ভ্রু কুঁচকে একবার ওর দিকে তাকিয়ে মোবাইল রিসিভ করে অনিক।

- 'হ্যালো।' ওপার থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠ। 'কে অনিক না কি?'

- 'হ্যাঁ, কে বলছেন?'

- 'আমি বাবা। তিথির আম্মু। তিথি তো কাল রাত থেকে আজ এখন রাত দশটা পর্যন্ত বাড়ি ফিরেনি। তুমি কী জানো ও কোথায় আছে? অনিক কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক থাকে। তারপর নির্দয় কণ্ঠে বলে- 'না তো আন্টি আমি তো জানি না!'

কেটে যায় ফোনের লাইন। ছাত্রের মুখের দিকে তাকায় অনিক। এখনও সে মিটিমিটি হাসছে। অনিক বললো- 'আবিদ, তুমি আমার মোবাইল বাজলে হাসো কেন?'

- 'স্যার, আপনার রিংটোনটা হাস্যকর তাই।'

- 'ও! এর চেয়ে ভালো টোন আমার মোবাইলে নেই আবিদ। সস্তা মোবাইল তো? আবিদ কিছু বলে না। চুপচাপ ওর লেখা শেষ করে।

তিন

পরেরদিন বিকালবেলা।

- 'প্লিজ, সুইট হার্ট, সবইতো তোমার জন্য।' স্কাইপিতে আকাশ এক অদ্ভুত সুন্দর মেয়ের সাথে কথা বলছে। মেয়েটাকে দেখেই ওর মাথা ঘুরে গেছে।

-'ও! তাই নাকি?'

- 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না।'

অনিক ভেতরে ঢোকে। বিশাল একটা রুম। বর্ণিল সৌন্দর্য দিয়ে ঘেরা রুমটা। আকাশ ভ্রু কুঁচকিয়ে তাকায় অনিকের দিকে। বলে- 'এটা কী আসার সময় হলো?'

- 'হ্যাঁ, হলো। এতো সস্তা সস্তা বাক্য তুমি সবাইকে বলো নাকি আকাশ?'

- 'মানে? দাঁড়াও পরে, ল্যাপটপে মেয়েটার দিকে তাকায়।

- 'একটু পরে কথা বলি?'

- 'ঠিক আছে।'

লগ আউট করে- 'কি ব্যাপার অনিক? হঠাৎ এ সময়? সস্তা বাক্য কোনগুলো? আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না'!

- 'এসব সস্তাই তো। নাটক সিনেমার কথা। যাই হোক...।'

- 'আরে অনিক, মেয়েরাতো এগুলোই গিলতে থাকে।'

- 'তিথির মা ফোন করেছিলেন। আঁৎকে ওঠে আকাশ।'

- 'কি বললো?'

- 'তিথি কোথায় জানতে চাচ্ছিলেন।'

- 'তুমি কী বলেছো?'

- 'জানি না বলেছি।'

আকাশ, এখনও সময় আছে নিজেকে শুধরে নাও, আত্মসমর্পণ করো।

আকাশ কথা না বলে কিছু একটা ভাবে। অনিক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানে কেবল নীরবতা বিরাজ করছে। অনিকের মন খুব খারাপ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বের হয়ে চলে যায়।

চার

প্রতিদিনের পরিশ্রমের ফলে অনিক বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। হালকা ঘুম এসে গেছে। মোবাইলটা বেজে ওঠে। মেসের অন্য সদস্যরা যার যার মতো নিজেদের কাজে ব্যস্ত। আকাশের ফোন আসায় বিরক্ত হলো অনিক। রিসিভ না করে ভাইব্রেশন ছাড়া সাইলেন্ট করে রেখে দেয়। ফলে ঘুমে আর ডিস্টার্ব হয় না। রাত একটা। রুমমেটের ডাকে ঘুম ভাঙে অনিকের। ঘুমকাতুরে। বিরক্ত ভরা কণ্ঠ অনিকের-

- ‘কি হলো?’

- ‘ওঠ, তোর ফোন এসেছে।’

- ‘আকাশের ফোন রিসিভ করবো না।’

অনিক কাঁথা শরীরে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরে শোয়। রুমমেট আবারো ডাকে। তিথির ছোট বোন ফোন করেছে। লাফিয়ে ওঠে অনিক। রুমমেটের হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নেয়।

- ‘হ্যালো! বিথি!’

বিথির কান্নাজড়িত কণ্ঠে-

- ‘অনিক ভাইয়া, আপুকে পাওয়া গেছে। আপু এখন হাসপাতালে আইসিইউতে। দোয়া করবেন প্লিজ।’

পাঁচ

আইসিইউ কেবিনের সামনে বিথি। অনিক দ্রুত এসে ওর পাশে দাঁড়ায়। শংকিত কণ্ঠে- ‘এখন কী অবস্থা?’

- ‘কি জানি? ডাক্তার কিছু বলছে না। আম্মু ভেতরে গেছে। আপু নাকি কথা বলতে চেয়েছে।’

- ‘আলহামদুলিল্লাহ। আকাশ আসছে কি?’

- ‘আমার মনে হয় উনি আসবেন না। যদি আমার ধারণা সঠিক হয়।’

- কি রকম?’

- ‘আপু শেষ যেদিন বাসা থেকে বের হয়, সেদিন আমাকে বলেছিলো আকাশের সাথে একটা বোঝাপড়া করে তবেই ফিরবো। কিন্তু ফিরে নি। আর এখন এই অবস্থা। আমি ওনাকে ছাড়বো না। অনিক ভাইয়া আমি জানি, আপনি ওনার বন্ধু কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ আলাদা একজন মানুষ। জেনে শুনে এতো খারাপ মানুষের সাথে কেন আছেন?’

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় অনিক। তবুও বলে- দেখো বিথি, আমি চেয়েছিলাম ওকে বুঝিয়ে ভালো পথে নিয়ে আসতে। কিন্তু পারলাম না।

বিথির বাবা এসে দাঁড়ান গম্ভীর ও ব্যথাহত কণ্ঠে- ‘তুমি কি জানো সেটা বলো অনিক। সেদিন ঠিক কি ঘটেছিল?’ অনিক মাথা নিচু করে।

চার-পাঁচজন পুলিশ এসে অনিকের হাতে হাতকড়া লাগায়। হতবাক হয়ে যায় অনিক। বিথি আর তার বাবা। পুলিশ দাঁতে দাঁত চেপে বলে- 'আকাশ সাহেব ব্যাপারটা না জানালে তো জানতামই না।'

অনিক দ্রুত কণ্ঠে- 'কিসের ব্যাপার? আর আমাকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন?'

- 'এই ন্যাকা চলো, টের পাবে।'

- 'খুনের চেষ্টা করে ন্যাকামী হচ্ছে না?'

জীবন পথে যখন কেবলই মোড় ঘুরে আনন্দের দেখা পাওয়ার কথা, অমনি বিশাল এক ধাক্কা এসে অনিককে মাঝ সমুদ্রে ফেলে দিলো। মিথ্যা এভাবেই সবটা নষ্ট করে দেয়। আর এভাবেই প্রতারিত হয় কেউ কেউ!